ভারতের বৃহৎ জনগোষ্ঠী গ্রামে বাস করলেও গ্রাম বা গ্রামীণ জীবন সম্বন্ধে মুঘল যুগের প্রতিবেদন সবিশেষ নেই। তবে জমি সংক্রান্ত দলিল, ভূমি রাজস্বের তালিকা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামকে গাঁও, গাঁ, দেহ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হত। এর মধ্যে বেশ কিছু অঞ্চল ছিল দুর্গম, হিংস্র জন্তু অধ্যুষিত বিশাল অরণ্য এবং মরু অঞ্চল। কর্ষণযোগ্য মোট জমির পরিমাপ করা ছিল দুঃসাধ্য। এই অঞ্চলগুলিতে গভীর অরণ্যের পাশাপাশি চারণভূমি, জরিপহীন পতিতজমি, সেইসঙ্গে আবাদী, আবাদের উপযোগী এবং জরিপের অন্তর্ভুক্ত পতিত জমির অস্তিত্ব ছিল। *"Cambridge Economic History of India"*-র একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ঔরঙ্গজেবের সময়ে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত মোট গ্রামের সংখ্যা ছিল 4,01,567টি, যার মধ্যে জরিপের আওতায় এসেছিল মাত্র 2,(0(),(0(3টি গ্রাম, যার মোট আয়তন ছিল 2,57,42,337 বিঘা।

ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করেই গ্রামীণ জনতা বিভিন্ন জাত ও বর্ণের ভিত্তিতে বিভক্ত ছিল। বসতিও গড়ে উঠেছিল সেইভাবে। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে নানা জাতের ভিত্তিতে গ্রাম গড়ে উঠলেও গ্রামীণ উৎপাদন ও অর্থনীতির চেহারা সর্বত্র প্রায় একই ছিল। বহু দিন থেকেই গ্রামীণ উৎপাদনকে শোষণ করে নানা কাজে লাগানোর পদ্ধতি ছিল। সুলতানী যুগেও ইক্তাদার, সাধারণ সেনা ও অন্যান্য সরকার পোষিত আধিকারিকের সেবায় গ্রামীণ উৎপাদনকে কাজে লাগানো হয়েছিল, তেমনি নগরায়নের গতি ত্বরান্বিত হওয়ায় সেই উৎপাদন শহরমুখী হয়ে পড়েছিল। আলাউদ্দিন খলজীর রাজত্বকাল থেকেই নগদে *খরাজ* আদায় করা শুরু হলে গ্রামীণ উৎপাদনের বাণিজ্যিক দিকটি সমৃদ্ধ হতে শুরু করে। মুদ্রা অর্থনীতির বিকাশ এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল। মুঘল যুগও এর ব্যতিক্রম নয়। এ সময় গ্রামে নগদের প্রচলন যেমন ছিল, তেমনি বিনিময় প্রথাও ছিল। তবে গ্রামীণ উৎপাদন রাষ্ট্রের পক্ষে বেশি প্রয়োজনীয় ছিল। ইরফান হাবিব দেখাচ্ছেন, কোনও জাতের মানুষ যদি চাষ করতে ইচ্ছুক না হয়, তাহলে শাসক তাদের গ্রাম থেকে উৎখাত করে সেখানে অন্য জাতের মানুষের বসতি স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতেন।

জাতিভিত্তিক গ্রামের চেহারার সঙ্গে তাই উৎপাদন ব্যবস্থার যোগ ছিল নিবিড়। যেমন, কলু-অধ্যুষিত গ্রামের প্রধান উৎপাদন ছিল তেল। নয়নসী রচিত মাড়ওয়াড়ের গ্রামীণ পরিসংখ্যান *"ভিগত"* থেকে জানা যায়, অনেক ক্ষেত্রেই গ্রাম গড়ে উঠত একই পেশাভিত্তিক জাতের মানুষদের নিয়ে। মিশ্র গ্রামগুলিতেও একটি নির্দিষ্ট জাতের প্রাধান্য থাকত। কোনও রাজপুত যদি অন্য জাতের গ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপন করত তাহলে তাকে জাতিচ্যুত করা হত। গ্রামের জমিন্দারও একই জাতের হতেন। আবুল ফজল প্রদত্ত জমিন্দারদের তালিকাতে তাঁদের ব্যক্তিগত জাত উল্লেখ করে মন্তব্য করা হয়েছে। জমিন্দারের জাতই ছিল গ্রামের সাধারণ মানুষের জাত।

প্রতিটি গ্রামে পরিবার ছিল দুই ধরণের — (১) যারা যুগ যুগ ধরে সেই গ্রামে বাস করে আসছে এবং একই জাতের। এদের বলা হত *লোক*। ধরা হয়ে থাকে, কোনও এক অতীতে সমস্ত গ্রামবাসীর পূর্বপুরুষ ছিল অভিন্ন। এরা গড়ে তুলেছিল *বেরাদরী*। (২) অপর পরিবারগুলিকে অন্য স্থান থেকে এনে বসতি করা হয়েছিল, যাদের বলা হত *বসী*। দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিবার অধ্যুষিত গ্রামের সংখ্যা ছিল নগন্য। বসী পরিবারগুলির মধ্যে ঐক্য ছিল না। *কর্ণেল টড* রাজপুতানার ইতিহাস লিখতে গিয়ে বলেছেন, কোনওভাবে গ্রামপ্রধানের কাছে ঋণী থাকার কারণেই এই পরিবারগুলিকে বসতি করানো হয়েছিল। এরা আদি পরিবার বা লোক অপেক্ষা নিচু জাতের। প্রাচীন কাল থেকেই হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়গণ (বা রাজপুত) চারণের কাজ এবং বানিয়া বা বৈশ্যগণ কৃষিকাজ করত না। তাই রাজপুত গ্রামগুলিতে কৃষিকাজ করত নীচু জাতের মানুষেরা। গ্রামের প্রধান ও অগ্রগণ্য জাতের উল্লেখ থাকলেও এবং তারাই অধিকাংশ জমির মালিক হলেও নীচু জাতের মানুষের বা সাধারণ কৃষকের জাতের কোনও নির্দিষ্ট উল্লেখ কোথাও নেই।

ভারতীয় গ্রাম-সমাজ গড়ে উঠেছে *পঞ্চ*-এর ভিত্তিতে। গ্রামীণ পরিবারগুলির পরিচালনকর্তা ছিল *পঞ্চায়েত*। এই *পঞ্চ* অর্থে গ্রামের অধিবাসী, যাদের হাতে জমির স্বত্ব আছে এবং গ্রাম-সমাজের বিধিব্যবস্থা যারা অনুমোদন করে। তবে *পঞ্চায়েত* অর্থে যে নির্দিষ্ট একটি পরিবারের প্রাধান্য, তা নয়। মুঘল ভারতে গ্রামের অধিবাসী ও জমির স্বত্বাধিকারী অর্থেই *পঞ্চ* শব্দটি প্রযুক্ত এবং এক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান ভেদাভেদ ছিল না। প্রাচীনকালের কোনও হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম পরবর্তীকালে মুসলমান প্রধান হলেও সেই গ্রামের মুসলমান তার পূর্বকালীন হিন্দু স্বত্বাধিকারীকে নিজের *পূর্বপুরুষ* বা *বুজুর্গ* হিসাবে দাবী করত। তবে পরিবারের প্রত্যেক সদস্য নয়, পরিবারের

Scanned with CamScanner

প্রধানই *পঞ্চ*-তে যোগ দিতে পারতেন। গ্রামের যাবতীয় পতিত জমি ও জলাশয়ের উপর পঞ্চায়েতের অধিকার ন্যস্ত ছিল। তবে গ্রামীণ আদিম অধিবাসীদের অধীনস্থ জমির উপর *পঞ্চ*-র কর্তৃত্ব কখনও গ্রাহ্য করা হত না। এভাবেই গ্রামে কৃষিজমির উপর ব্যক্তি মালিকানা এবং পতিত জমির উপর গ্রাম-সমাজের মালিকানা স্থাপিত হয়েছিল। বহুক্ষেত্রে *পাহিকাস্ত*-দের সাহায্যে পঞ্চায়েত পতিত জমি উদ্ধার করত। কিন্তু চাষের পর সেই জমির ভাগ্য কিভাবে নিরূপিত হত, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে গ্রামের জমিন্দার পতিত জমি ইজারা দিয়ে আবাদযোগ্য করত। এর জন্য গ্রাম-সমাজের পক্ষ থেকে একজন *পাটোয়ারি* বা হিসাবরক্ষক নিযুক্ত করা হত। প্রতিটি গ্রামে আয়-ব্যয়ের হিসাব তাদের নথি থেকে পাওয়া যেত। এরা সরকার দ্বারা নিযুক্ত বা প্রেরিত না হলেও গ্রামের রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এদের কাছে থাকার ফলে এদের দেওয়া হিসাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। *রসিকদাস করোরী*কে দেওয়া ফরমানে ঔরঙ্গজেব স্বয়ং সে কথা উল্লেখ করছিলেন। গ্রামবাসীরা পঞ্চায়েতকে যে অর্থ দিত তাকে সাধারণভাবে বলা হত *বাছ* বা *বেহারী-মাল*। গ্রামের যৌথ দায়, তা সরকারী হোক্ বা অন্য কিছু, পঞ্চায়েত এই অর্থ থেকেই নির্বাহ করত।

শুধুমাত্র কৃষকদের নিয়ে অবশ্য কোনও গ্রাম গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। কামার, কুমোর, ছুতোর, তাঁতি — এমন বেশ কিছু পেশাভিত্তিক জাতের পরিবারকে গ্রামে বসতি করাতে হত গ্রামবাসীর স্বার্থে। তাদের দু'ভাবে সাহায্য করা হত — প্রথমতঃ, গ্রামসমাজের জমির একটা অংশ বরাদ্দ করে এবং দ্বিতীয়তঃ, প্রতিটি কৃষক পরিবার থেকে ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রদান করে। যে জমি বন্টন করা হত, তা ছিল রাজস্বমুক্ত। এই সাহায্যের বিনিময়ে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা গ্রামের নানা কাজ নিয়মিত করে দিত। ব্যাডেন পাওয়েল *"ইণ্ডিয়ান ভিলেজ কমিউনিটি"*-তে তাই বলেছেন, গ্রামের সেবক ও কারিগররা গ্রাম-সমাজেরই ঘনিষ্ঠ অঙ্গস্বরূপ। যদিও ডব্লিউ. এইচ ওয়াইসার তাঁর *"দ্য হিন্দু জজমানি সিস্টেম"* গ্রন্থে এই মত অস্বীকার করে বলেছেন যে, গ্রামের কয়েকটি পরিবারের অধীনেই প্রাথমিকভাবে কারিগর ও অন্যান্য সেবকেরা কাজ (জজমানি) করতে শুরু করেন। কিন্তু *ওয়াইসার*-এর বক্তব্য ঠিক নয়। গ্রাম-সমাজ তার যৌথ জমি থেকেই পেশাভিত্তিক কারিগরী জাতগুলিকে জমি বন্টন করত এবং তা রাজস্বমুক্ত ছিল। কিন্তু গ্রাম-সমাজকে সরকারের রাজকোষে পুরো জমির রাজস্বই মেটাতে হত। অর্থাৎ গ্রামের মানুষের দাক্ষিণ্যেই ওই শ্রেণীর মানুষদের প্রতিপালন হত। এই পেশাভিত্তিক কারিগর শ্রেণী কিন্তু *পঞ্চ*-এর সদস্য হতে পারত না। তাদের বহিরাগত বলে আলাদা করেই রাখা হত।

সুলতানী যুগের মুকদ্দমদের মতো মুঘল যুগেও গ্রাম শাসন করতে গিয়ে পঞ্চায়েতের প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ (কলান্তরাণ) কৌশলে নিজেদের দেয় খাজনার বোঝা সংখ্যাগুরু সাধারণ কৃষকের উপর চাপিয়ে দিতেন। যদিও সুলতানী যুগে আলাউদ্দিন খলজী তাঁদের দমন করেন এবং মুঘলযুগেও ঔরঙ্গজেব রসিকদাসকে প্রদত্ত ফরমানে উল্লেখ করেছিলেন যে, রাজস্ব-নথি তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে গ্রামের মাতব্বররা নিজেদের দায় কোনওভাবে কৃষকের উপর চাপিয়ে না দেয়।

"দস্তুর-উল্-অমাল-ই-আলমগিরি" গ্রন্থের সাক্ষ্য অনুযায়ী প্রতিটি গ্রাম আলাদা জমি বা হালি, বাস্তুজমি, নালা, পুষ্করিণী, বাগিচা ও পতিত জমির সমন্বয়ে গঠিত ছিল। গ্রামের সীমানা নির্দিষ্ট থাকত, যদিও গ্রামগুলির সীমানা অনুরূপ ছিল না। হালিজমিগুলি ছোট-বড় খণ্ডে বিভক্ত থাকত এবং তাদের সীমানাকে বলা হত *আল্*। রাজস্ব হিসাবের ক্ষেত্রে গ্রামগুলিকে *আসলি*, *দাখিলি* এবং *রাইয়তি* ও *তালুকী* — এই দু'ভাবে ভাগ করা হত। *"খুলাসত্-উস্-সিয়াক"* গ্রন্থের মতে, যে সকল গ্রামের অধিবাসীরা গ্রামেই বসবাস করত, সেগুলিকে বলা হত *আসলি*। অন্যদিকে যে গ্রামের অধিবাসীরা কালক্রমে অন্যান্য গ্রামের সাথে মিলিত হয়ে নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব মুছে দিত তাদের বলা হত *দাখিলি*। সম্ভবত, যখন কোনও বৃহৎ ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ক্ষুদ্র পল্লীতে রূপান্তরিত হত তখন তাকেও *দাখিলি* নামে চিহ্নিত করা হত। পরগনার অন্তর্ভুক্ত কিছু গ্রাম রাইয়তি ও তালুক নামেও অভিহিত হত। *এন. এ. সিদ্দিকী* লিখেছেন যে, রাইয়তি গ্রাম বলতে সেইসকল গ্রামগুলিকে চিহ্নিত করা হত, যেগুলি কোনও জমিন্দারের নিষ্কর তালুক অথবা পেশকাশ দেওয়ার অধিকারী কোনও জমিন্দারের তালুক বহির্ভূত। *রাইয়তি* গ্রামে রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহ সংক্রান্ত আইনবিধি চালু ছিল। এখানে কৃষিজীবীদের একাংশ বিশেষ অধিকার বলে জমি হস্তান্তর করতে পারত। *রাইয়া* নামের কৃষকদের সে অধিকার ছিল না। অন্যদিকে প্রশাসনিক প্রয়োজনে কয়েকটি গ্রামের সমাহারকে *তালুক* বলা হত। তালুকের জমিদারী স্বত্ব পেশকাশের বিনিময়ে ও সমসাময়িক সাহায্যদানের শর্তে কোনও জমিন্দার বা কয়েকজন জমিন্দারের সমন্বিত সমিতির হাতে অর্পণ করা হত।

গ্রামের অধিকাংশ মানুষই আদিম বসতি যারা করেছিল তাদের উত্তরাধিকার বহন করত। সতীশ চন্দ্রের মতে, গ্রামের কৃষক স্থূলভাবে দুইভাগে বিভক্ত ছিল — (১) রিয়ায়তি এবং (২) রায়তি। *রিয়ায়তি* বলতে গ্রামে বসবাসকারী জমির স্বত্বাধিকারীকে বোঝাত, ফার্সী ভাষায় যাদের বলা হত *খুদকাস্ত*। মহারাষ্ট্রে এবং রাজপুতানার ব্যাপক অংশে এদের যথাক্রমে *মিরাসি* এবং *ঘর-হালা* বলা হত।

Scanned with CamScanner

গ্রামীণ সমাজে *খুদকাস্ত*-কে বিভিন্ন আবওয়াব ইত্যাদি দিতে হত না। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ আমলা ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের মতে, খুদকাস্ত ছিল গ্রামীণ ভদ্রলোক শ্রেণী। *রায়তি* হল বহিরাগতরা, যারা কৃষির কাজে এসে সেখানে বসতি স্থাপন করে সমাজের অংশ হয়েছে। রিয়ায়তি কৃষকদের একাংশকে প্রধানত রাজপুতানায় দেখা গেলেও উত্তর ভারতের বহু স্থানে তাদের অস্তিত্ব ছিল। সাধারণতঃ তারা ছিল উচ্চবর্ণের ও সুবিধাভোগী শ্রেণী। যেমন, ব্রাহ্মণ, রাজপুত, মহাজন, বণিক, গ্রামীণ আদিকারিক যেমন, চৌধুরী, প্যাটেল, কানুনগো প্রভৃতি। তবে বর্ণাশ্রমের কারণে ব্রাহ্মণ নিজে জমি চাষ করতে পারত না, তাকে ভাড়াটে শ্রমিকের সাহায্য নিতে হত।

গ্রামের মোড়ল ছিল গ্রামের প্রধান ব্যক্তি। তার কাজ একইসঙ্গে রাজস্ব আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা দেওয়া, পুলিশ প্রশাসন চালনা করা এবং স্থানীয় বিবাদ মীমাংসা করা। তাকে সাহায্য করত অন্যান্য আধিকারিকেরা। পাটোয়ারীর কাজ ছিল কৃষি সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব নথিভুক্ত করা। চৌকিদারের কাজ ছিল সাধারণভাবে নজরদারি করা, ক্ষেতে পাহারাদারী করা এবং জরিপের কাজে সাহায্য করা। এছাড়াও যারা ছিল তাদের দায়িত্ব ছিল জলসেচের ব্যবস্থা চালু রাখা ইত্যাদি। এদের অতিরিক্ত ছিলেন গ্রামীণ পুরোহিত, নাপিত, ধোপা, কামার, কুমোর, ছুতোর, বৈদ্য প্রমুখ। জাতি অনুযায়ী কুলপুরোহিতও আলাদা হতেন। কারণ ব্রাহ্মণদের মধ্যেও শ্রেণী বিভাজন ছিল। *পি. শরণ* লিখেছেন, গ্রামের দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করার জন্য কয়েকটি ছোট ছোট সমিতি ছিল এবং 35 থেকে 70 বছর বয়ঃক্রমের পুরুষদের নিয়ে সেগুলি গঠিত ছিল। কখনও কখনও মহিলাদেরও গ্রাম সমিতির সদস্যা হতে দেখা যেত। কোনও ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী গ্রাম-সমাজ পরিচালিত হত না। সমবেতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হত এবং রূপায়িত হত। এভাবেই যুগ যুগ গ্রামীণ সমাজ এক পারিবারিক চরিত্র অর্জন করেছিল।

'বাবরনামা" গ্রন্থের ভাষ্য অনুযায়ী মুঘলযুগে ভারতের গ্রামীণ সংগঠনগুলির প্রকৃতি এক ছিল না। রায়তি স্বত্ব, সামাজিক সম্পর্ক ও কৃষকদের সঙ্গে জমির সম্পর্ক নানা গ্রামে নানারকম ছিল। অবশ্য উৎপন্ন শস্য বন্টনের পদ্ধতি সব গ্রামে মোটামুটি একইরকম ছিল। পরিবর্তনের মূলে ছিল জায়গির পদ্ধতির ভিন্নতা। গ্রামীণ লোকসমাজে বংশানুক্রমিক শ্রমবিভাগ এবং কৃষি ও অকৃষি হস্তশিল্প সংগঠন ছিল বেশ জটিল। প্রাথমিকভাবে প্রতিটি পরিবার কৃষিকার্যের পাশাপাশি উপবৃত্তি হিসাবে হস্তশিল্পের চর্চা করত। পরের দিকে শহরের সংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষিক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা শিল্পোৎপাদনকে একটি স্বনির্ভর ও স্বতন্ত্র পূর্ণসময়ের বৃত্তি হিসাবে জনপ্রিয় করে তোলে। *রাধাকমল মুখার্জী* তাঁর *"Economic History of India (1600-1800)"* গ্রন্থে বলেছেন, মুঘলযুগের শেষদিকে রাজনৈতিক ও আর্থিক বিশৃঙ্খলা, জায়গির প্রদানের ব্যাপকতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিজাতগণ কর্তৃক স্বতন্ত্র আঞ্চলিক রাজ্য গঠনের প্রয়াস, রায়তি স্বত্বের পরিবর্তন প্রভৃতির মিলিত ফলস্বরূপ উত্তর ভারতের গ্রামীণ সমাজের ধ্বংস অনিবার্য হয়। ভারতীয় গ্রাম ছিল বহুলাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বহির্জগৎ থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন। ঊনবিংশ শতকের শুরুতে ব্রিটিশরাও একই চিত্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন। *ব্যাডেন পাওয়েল* তাঁর *"Land System of British India"* গ্রন্থে এ বিষয় আলোকপাত করেছেন। *মেটকাফ*-এর মতে, ভারতের গ্রাম ছিল এক-একটি ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র। প্রতিটি গ্রামই ছিল একটি পরিবারের মতো। সেখানে যাবতীয় বিষয়র নিষ্পত্তি ঘটানো হত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে, কর্ণওয়ালিশের যাবতীয় সংস্কারের ফলেই এই গ্রামীণ কাঠামো নষ্ট হয়ে যায়।

Scanned with CamScanner